ধনেশ্বর চন্দ্রকেতু সংবাদ

আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক কিছুদিন আগে অফিসের কাজে দিল্লী গেছিলেন। কাজকর্ম সেরে ফেরার পথে নিউদিল্লী স্টেশনে তাঁর স্যুটকেসটি খোয়া গেল।

গিন্নী পই পই করে বলে দিয়েছিলেন, "দেখো জিনিসপত্র সম্বন্ধে সাবধান। রাজধানী শহর, ঠগ জোচ্চোরের রাজত্ব। স্যুটকেস কষে ধরে থাকবে, একদম কাছছাড়া কোরো না।"

স্যুটকেসটা হাতেই ছিল এতক্ষণ। ট্রেনটা ঠিক প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করার প্রাক্কালে, ভিড় ঠেলাঠেলির মাঝে হঠাৎ পিঠময় পচাগন্ধ তরল কিছু অনুভব করলেন।

পাশ থেকে কেউ বলে উঠলো, "ইস্! আপনার পিঠের উপর বমি করে দিলো মশাই। যান যান চটপট ধুয়ে ফেলুন। ওই যে ওই সামনেই কল রয়েছে।"

দুর্গন্ধে ভদ্রলোকের নিজেরই বমি পেয়ে যাচ্ছে। কলের কাছে গিয়ে স্যুটকেসটা পাশে নামিয়ে রেখে সবে বুশশার্ট খুলে ধুতে আরম্ভ করেছেন কি সঙ্গে সঙ্গে স্যুটকেস উধাও। গেল গেল ধর ধর করতে করতে কোথায় যে উপে গেল, কে বা কারা যে হাতে হাতে পাচার করে দিলো তার বিন্দু মাত্র হদিশ মিললো না। এ ধরনের ঘটনা তো আকছারই ঘটছে আজকাল। পথে ঘাটে সজাগ হয়ে না চললে কেউ না কেউ বোকা বানিয়ে ফেলবে। চতুর্দিকে উন্মুখ হয়ে ঘোরাফেরা করছে তারা সম্ভাব্য শিকারের খোঁজে ----। বহু বছর আগে আমি একবার কি রকম বোকা বনেছিলাম সেই গল্পই আজ বলবো।

আমি তখন ইথিওপিয়ায় একটা স্কুলে শিক্ষকতা করি। মাত্র পদার্পণ ঘটেছে ওদেশে, সবকিছু আনকোরা নতুন আমার কাছে। শিফারোর সঙ্গে প্রথম দিনেই আলাপ হয়ে গেল। উনিশ কুড়ি বছরের মিশকালো লম্বা

সড়িঙ্গে ছেলেটি। এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। ভাঙা ভাঙা ইংরিজী বলতে পারে। ভারি হাসিখুশি সপ্রতিভ। সর্বদা সাহায্যার্থে প্রস্তুত। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল তখন। আমার তখন পদে পদে অসুবিধা। ওদেশের বুলি একবর্ণ বুঝি না। হাত নেড়ে ইশারা ইঙ্গিতে কোন মতে কাজ চালাই। বাজারঘাট কেনাকাটা কি করে কি হবে ভেবে হদিশ না পেয়ে শিফারোর শরণ নিলাম। শিফারো এক কথায় রাজি। আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে স্টোভ, কেরোসিন, আনাজপাতি, তৈজসপত্র, চা-চিনি-সাবান-টুথপেস্ট সব কিনিয়ে দিলো। অন্য বড় জিনিসগুলো - ঘরের আসবাবপত্র চেয়ার টেবিল - সে সব কিনতে মানা করলো। বললো, "কেন মিথ্যে এক কাঁড়ি টাকা খরচ করে নতুন জিনিস কিনবে। আমি তোমায় অর্ধেক দামে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড সব কিছু পাইয়ে দেবো। এইতো আমাদের অফিসের এক ভদ্রলোক বদলি হয়ে চলে যাচ্ছে। জলের দামে বেচে বিলিয়ে দিয়ে যাবে সব। দু'চার দিন সবুর করো।"

ওর কথা শুনে আমি মহাখুশি। সত্যি টাকা কি ফ্যালনা যে অযথা বেশী দাম দিয়ে জিনিস কিনবো। তাছাড়া কদিনই বা থাকবো এদেশে। তিন বছরের কন্ট্র্যাক্ট, তারপর তো সব কিছু জলের দরেই বেচে বিলিয়ে দিতে হবে আমাকেও। সেকেণ্ড হ্যাণ্ডই ভাল। তা সে জিনিসপত্র পাছে বেহাত হয়ে যায়, অন্যেরা আগে ভাগে কিনে ফ্যালে তাই তক্ষুনি শিফারোর হাতে টাকা গুঁজে দিতে গেলাম।

শিফারো বিনীত হেসে বললো, "আহা এত তাড়া কিসের। টাকাটা পরে দিলেও চলবে। আজ গিয়ে কথা বলে আসবোখন।"

আমি বললাম, "কথা বলা নয়, আজই নগদ দাম গুনে দিয়ে জিনিসগুলো কিনে ফেলা চাই। দেরী করলে অন্য কেউ নিয়ে নেবে। তখন আবার হা পিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে আবার কখন কে বদলি হয়ে চলে যাবে সেই আশায়। শুধু আসবাবপত্র নয়, টুকিটাকি আরও যা কিছু পাওয়া যায়।"

শিফারোর হাতে তালিকাসমেত হাজার দেড়েক টাকা ধরিয়ে দিলাম। একটু অপ্রস্তুত মুখে টাকাগুলো গুনে নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজলো শিফারো।

কথা ছিল দু'তিন দিনের মধ্যে জিনিসগুলো দিয়ে যাবে। কিন্তু দু'সপ্তাহ কেটে গেল শিফারোর টিকিটিরও দেখা নেই। শেষ অবধি ওর অফিসে গিয়ে চড়াও হলাম। আমাকে দেখে শিফারো সে কি খুশি!

উদ্ভাসিত মুখে বললো, "তোমার কাজ হয়ে গিয়েছে। একটু বোসো, এক্ষুনি আসছি।"

আমার জন্যে চা পাঠিয়ে দিলো।

খানিক বাদে অফিস ছুটি হতে দু'জনে বাইরে এলাম। শিফারোর মুখে কথার তুবড়ি ফুটতে লাগলো। ভাঙা ভাঙা ইংরিজীতে আমার সদ্য কেনা আসবাবপত্রের প্রশংসায় উচ্ছল হয়ে উঠলো সে।

"চলো এক্ষুনি তোমায় জিনিসগুলো দেখিয়ে নিয়ে আসি। বেশী দূরে নয় বাড়িটা।"

কিছুদূর চলার পর ও হাত লম্বা করে দূরে পাহাড়ের দিকে দেখিয়ে বললো, "ওই সবুজ বাড়িটা দেখতে পাচ্ছো?"

পাহাড়ের চুড়োয় আবছা সবুজমত কিছু দেখা যাচ্ছে বটে। খুব সম্ভব বাড়িই। কিন্তু সে তো বহু দূরে। আর ওই চড়াই ভেঙে ওঠা কি চাট্টিখানি কথা?

শিফারো সোৎসাহে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, "কিচ্ছু ভেবো না। আমি তোমায় হাত ধরে নিয়ে যাবো ওখানে।"

আমি রাজি হলাম না। ওই খাড়া পাহাড়ে চড়তে গিয়ে আছাড় খেয়ে মরি আর কি? আর জিনিসগুলো তো কেনা হয়েই গেছে, কালই তো মুটে দিয়ে বাড়ি পৌছে দেবে শিফারো। বাড়িতে বসে ধীরে সুস্থে খুঁটিয়ে দেখে তারিফ করা যাবে তখন। এক্ষুনি এই দণ্ডে অতখানি ঝুঁকি নিয়ে ওগুলো নাই বা দেখলাম। শিফারো বেশ মিইয়ে গেল আমার কথা শুনে। একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে ওকে ইনজেরা আর ওয়াৎ খাইয়ে তুষ্ট করলাম। কথা রইলো কাল বিকেলেই জিনিসগুলো আমায় দিয়ে যাবে।

পরদিন সকালে স্কুলে যাবার আগেই শিফারো এসে হাজির। হাতে একটা রেডিও। এটাও নাকি ও কিনেছে আমার জন্যে। মাত্র ছ'শো টাকা দাম।

বললাম, "আমার তো এখন রেডিওর দরকার নেই!"

ও ফ্যাকাসে মুখে বললো, "সে কি? আমি যে কিনে ফেলেছি !"

রেডিওটা নাকি ভদ্রলোক আটশো টাকায় বিক্রি করেছিল। শিফারো পিড়াপিড়ি করায় সেই গ্রাহকের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আবার আমায় বিক্রি করেছে সস্তা দামে, দু'শো টাকা কমে। মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। সত্যিই এখন রেডিও কেনার ইচ্ছে বা প্রয়োজন ছিল না মোটেও। এদিকে শিফারো শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

মিয়োনো গলায় বিড় বিড় করছে, "কি হবে তাহলে? আমার কথা শুনে ও রেডিওটা ফেরৎ নিলো।"

বললাম, "কেন, ও সেই গ্রাহককেই ওটা বিক্রি করুক আবার আটশো টাকায়। আমি ওকে লাভের অংশ থেকে বঞ্চিত করতে চাই না।"

শুনলাম তা নাকি আর সম্ভব নয়। সেই হবু গ্রাহক নাকি এখানকার বাসিন্দা নয়, পর্যটক। এখন আর তাকে কোথায় খুঁজতে যাবে? তাছাড়া হাতে সময়ও নেই আর। ভদ্রলোককে এখনই রওনা হতে হবে। মালপত্তর গাড়িতে তুলে দিয়ে ওই টাকাটার জন্যে অপেক্ষা করছে, রেডিওর দাম বাবদ ছ'শো টাকা। শিফারো গিয়ে টাকাটা দিলেই গাড়িতে উঠে পড়বে পরিবার সমেত। অপ্রসন্ন মনে কড়কড়ে নোটগুলো শিফারোর হাতে দিয়ে স্কুলের পথ ধরলাম।

এরপর আরও আট দশ দিন কেটে গেল। শিফারোর দর্শন নেই। ওর অফিসে বার কয়েক গিয়েও ওর দেখা পাইনি। ভাষা বিভ্রাটের জন্যে ভাল করে খোঁজ খবরও নিতে পারি না। এরপর আমার এক দৈনন্দিন কাজই হয়ে গেল শিফারোর অফিসে গিয়ে ধর্ণা দেওয়া। একদিন ওই দপ্তরের একজন ঊর্ধ্বতন অধিকারীর সঙ্গে কথা হল। আমি শিফারোর দর্শনাভিলাষী শুনে তিনি বললেন শিফারোকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা শিফারো ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে হাজির। জিনিসগুলো নাকি সেদিন দুপুরে মুটের ঘাড়ে করে আমার বাড়ি এনেছিল। আমি তখন স্কুলে। তাই বাধ্য হয়ে সেগুলো অদূরে এক সরকারী দপ্তরে রেখে দিয়েছে ওর মাসতুতো ভাইয়ের হেফাজতে। ও আমার কাছে আসার আগে সেই মাসতুতো ভাইয়ের খোঁজে গেছিল। তার ঘর তালাবন্ধ, সে কোথাও বেরিয়েছে। আরও তিন চার দিন হাঁটাহাঁটি করে আবার শিফারোর দর্শন পেলাম। ভারি মুষড়ে পড়েছে সে। মাসতুতো ভাই নাকি অফিসের কাজে অন্য মুলুকে চলে গেছে হঠাৎ। আমার জিনিসগুলো সযত্নে তালা মেরে রেখে গেছে নিজের খাস কামরায়। জিনিসগুলোর জন্যে চিন্তার কারণ নেই। তবে কিনা মাসতুতো

ভাই কবে ফিরবে তার নাকি কোন নিশ্চয়তা নেই।

এরপর আরও দিন দশেক কেটে গেল। সেদিন রবিবার। প্রতিবেশিনী আমিনাৎ বেকেলের সঙ্গে ঘরে বসে গল্প করছিলাম। আমিনাৎ বেকেলে অল্প স্বল্প ইংরিজী বুঝতে ও বলতে পারে। একটা বছর আষ্টেকের ছেলে এসে চৌকো মতন একটা কাগজের মোড়ক দিয়ে গেল আমায়। ইশতিহারের সাইজের প্রকাণ্ড একখণ্ড কাগজকে বহুবার ভাঁজ করে মুড়ে আষ্টেপৃষ্টে সেলাই করা। সাবধানে সেলাই খুলে কাগজখানা মেলে ধরলাম। অজস্র ভুলে ভরা কাঁচা হাতের দু'লাইন চিঠি। তলায় শিফারোর নাম। শিফারো জানিয়েছে অফিস থেকে তাকে স্থানান্তরে পাঠানো হচ্ছে অনিশ্চিত কালের জন্য। আজই অবিলম্বে রওনা হতে হবে। আপাতত কয়েক মাসের মধ্যে আর তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে না।

চিঠির পাঠোদ্ধার এবং মর্মোদ্ধার করে স্তব্ধ হতবাক হয়ে গেলাম। প্রচণ্ড রাগে মাথাটা দপ্‌দপ্‌ করতে লাগলো।

আমার রকম সকম দেখে আমিনাৎ বেকেলে অবাক গলায় শুধোলো, "মিসাস, মিসাস, হোয়াট হ্যাপেন্‌ড্‌?"

গড়গড় করে আদ্যোপান্ত বলে গেলাম সব। সেই প্রথম যেদিন কড়কড়ে নোটের গোছা শিফারোর হাতে গুঁজে দিয়েছিলাম সেইদিন থেকে শুরু করে তারপর গত পাঁচ মাস ধরে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানোর কথা।

আমিনাৎ চোখ কপালে তুলে বললো, "হেই মা, এ যে ডাহা ঠডবাজি গো!"

কাছেই এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের হিরুট কেবেডের বাড়ি। আমিনাৎ তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ডেকে আনলো। উত্তেজিত গলায় কথাবার্তা হল দু'জনের।

হিরুট কেবেডে বললো, "এতো ভারি সাংঘাতিক কথা। আপনি আমার সঙ্গে চলুন, এডুকেশন অফিসারকে ব্যাপারটা এক্ষুনি জানানো দরকার।"

হাঁটাপথে মাইল খানেক দূরে এডুকেশন অফিসার তিলাহুন

আসেফা'র বাড়ি। তিলাহুন লুঙ্গি পরে আদুর গায়ে বাচ্চাদের খেলা দিচ্ছিলেন। স্ত্রী উঠোনে কাপড়ে ডাং নিয়ে বসে সাবান কাচছে। হিরুট কেবেডে কাছে গিয়ে হাত পা নেড়ে ঘটনার বিবৃতি দিলো এবং তা শুনে তিলাহুন আসেফা'র মুখে বিচিত্র সব অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে লাগলো।

আমার দিকে ফিরে বললেন, "ছোঁড়াটা এতদিন ধরে এই সব কীর্তি করছে আপনি আগে আমাদের জানাননি কেন? যাক আমি এর বিহিত করবো। ওর মাইনে থেকে কেটে আপনার টাকাটা আমরা আপনাকে পাইয়ে দেবো। বেশ ক'মাস লাগবে অবশ্য। খুব বেশী তো মাইনে পায় না ছেলেটা। আর অতগুলো টাকা!" তারপর একটু থেমে বিষন্ন গলায় যোগ করলেন, "দূর বিদেশে এসে এমন একটা বিচ্ছিরি অভিজ্ঞতা হল আপনার এ জন্যে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আশা করি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ দেশটা সম্বন্ধে আপনার মনে স্থায়ীভাবে একটা খারাপ ধারণা গেঁথে যাবে না। পৃথিবীর সব দেশেই এ ধরনের কিছু সংখ্যক লোক ছড়িয়ে আছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের দেশে এসে তাদের একজনের সঙ্গে মোকাবেলা হল আপনার ----।"

আমার তখনো পুরোপুরি রাগ যায়নি। সংক্ষেপে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম। পরদিন আমিনাৎকে নিয়ে বাজার করতে বেরোলাম। আসবাবপত্র ও খুটিনাটি যা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার ছিল কিনে ফেললাম। আমার হয়ে খুব দর কষাকষি করলো আমিনাৎ। বেশ সস্তায় জিনিসগুলো পাওয়া গেল।

এডুকেশন অফিস শিফারোর মাইনে থেকে কেটে মাসে মাসে কিস্তিতে টাকা দিচ্ছে আমায়। প্রায় শোধ হয়ে এসেছে টাকাটা। এমন সময় হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত হল একদিন। শুক্রবার স্কুলে শিবসভা বা মিটিং'এর দরুণ হাফ-ডে থাকে বরাবর। বিদেশী শিক্ষকদের সে মিটিং'এ ডাক পড়ে না। শনি-রবি মিলিয়ে আড়াই দিন আদিস'এ ছুটি কাটিয়ে সোমবার স্কুলে পদার্পণ করে শুনি ডিরেক্টর আমায় তলব করেছেন। ডিরেক্টর তেসফায়ে মেলাকে'র সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা শুনে আমি প্রায় মূর্ছা যাই আর কি! পুলিস স্টেশন থেকে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

দশাসই সরকারী হুকুমনামা পড়ে তর্জমা করে শোনালেন তেসফায়ে মেলাকে। শিফারো মেকনেন নামক ব্যাক্তিকে জনৈক কাসাও

এসকেদার'এর রেডিও চুরির দায়ে হাজতে পোরা হয়েছে। সেই চোরাইমাল তলব করেছে পুলিস। আমারই হেফাজতে আছে সেটা। আমি যেন পত্রপাঠ উক্ত চোরাইমাল সহ পুলিস স্টেশনে উপস্থিত হই। বিবৃতি শুনে আমার দু'চোখে আঁধার ঘনিয়ে এলো। তেসফায়ে মেলাকে তাড়াতাড়ি জল আনালেন। তারপর চা। ঢক ঢক পুরো এক গ্লাস জল খেয়ে চায়ের কাপ হাতে সুপ্তোত্থিতের মত বসে রইলাম।

ডিরেক্টর আশ্বাস দিয়ে বারংবার বলতে লাগলেন, "ঘাবড়াবেন না। আপনি মহিলা, তায় বিদেশী। অতিথিকে সম্মান সমাদর করা এদেশের ম জ্জাগত ঐতিহ্য। আমাদের আইন-কানুন পুলিসবিভাগ স্বৈরাচারী নয়। আপনি ভয় পাবেন না ----।"

আর ভয় পাবেন না! আমার কানে তখন সত্যনারায়ণের পাঁচালির ছড়া ধ্বনিত হচ্ছে - "হায় হায় একি হৈল আইয়া বিদেশে ----।"

(২)

ইংরিজী ভাষা হাইস্কুলের পাঠ্যনির্ঘন্টের অন্তর্ভুক্ত হলেও ক্লাসরুমের বাইরে ইংরিজীর চলন নেই একেবারেই। সরকারী দপ্তর দোকানপাট রাস্তাঘাটে সমস্ত সাইনবোর্ড, বিজ্ঞাপন, রোডসাইন, জনসাধারণার্থে আদেশ নির্দেশ নিষেধাজ্ঞা যাবতীয় কারবার চলে রাষ্ট্রভাষা আমহারিকে। সরকারী অফিসে ঝাণ্ডা ওড়ে, তাই দেখে বোঝা যায় সেগুলো সরকারী দপ্তর। এ ছাড়া কোনটা যে কি তা চেনার উপায় নেই। অতো মেলাকে রাস্তা বলে দিয়েছিলেন - বাঁয়ে মুড়ে তিন নম্বর ঝাণ্ডাওলা বাড়িটা পুলিস স্টেশন। দুরুদুরু বক্ষে গিয়ে হাজির হলাম সেই তলবনামা নিয়ে। কাগজখানা নেড়ে-চেড়ে দেখে ওরা আমায় আরেকটা ঠিকানায় পাঠালো। সেটা একাধারে শহরের ছোট থানা এবং হাজতঘর। শিফারো সেখানেই নাকি আপাতত আটক রয়েছে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে হদিশ পেলাম বাড়িটার। ছোট্ট জরাজীর্ণ একরত্তি বাড়ি। কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘুপচি মত একটা ঘর। উর্দিপরা দারোগা গোছের একটা লোক হুমড়িয়ে বসে আছে টেবিলে থাবা জমিয়ে। আমি কাগজখানা এগিয়ে দিতেই ছোঁ মেরে সেটা আমার হাত থেকে নিয়ে ভুরুজোড়া কুঁচকে গম্ভীর মুখ করে আদ্যোপান্ত পড়লো।

তারপর জোরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো বসে বসেই। ভিতর দিকের দরজা দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে একটা লোক এসে ঢুকলো। দারোগাবাবু বাজখাঁই গলায় তাকে কিছু নির্দেশ দিতেই লোকটা অন্য দরজা দিয়ে রাস্তায় নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি নিঃশব্দে ব্যাগ থেকে যত বিপত্তির মূল সেই অলুক্ষুণে রেডিওখানা বার করে সন্তর্পণে টেবিলের একপাশে রেখে একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। ঘরের মধ্যে একটা কম পাওয়ারের টিমটিমে বালব জ্বলছে। একপাশে দাঁড়িয়ে দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করছি পরবর্তী ঘটনার। গলা শুকিয়ে কাঠ। অন্যদিন এতক্ষণ বাড়ি ফিরে স্কুলের জামাকাপড় পালটে চা জলখাবার খেয়ে নিয়েছি কখন। এক গ্লাস জল চাইবো নাকি? আড় চোখে দারোগার ভ্রূকুটিকুটিল মুখমণ্ডলের পানে তাকালাম। "মানুষ কেন যে মানুষের প্রতি ধরি আছে হেন যমের মুরতি ---- "। থাক গে, জল খেয়ে কাজ নেই আর।

এদেশে প্রায় ন'দশ মাস রয়েছি। এখানকার লোকজন ভারি ভদ্র শান্ত অমায়িক আর অতিথিবৎসল। স্কুলে, রাস্তাঘাটে, যেদিকে তাকাও হাসিমুখের ভিড়। বিদেশীর সুখ সুবিধার প্রতি সদাজাগ্রত দৃষ্টি সকলের। প্রতি পদে অযাচিতভাবে কত যে উপকার পেয়ে এসেছি। কিন্তু এই পুলিস স্টেশনে এসে তার প্রথম ব্যতিক্রম দেখলাম। নিজেকে মনে হল নির্বান্ধব শত্রুপুরিতে বন্দী যেন। উপমাটা মনে হতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। সত্যিই তো। হাতে হাতকড়া পরিয়ে আমাকে যদি হাজতে পুরে ফেলে কি করতে পারি আমি! এদেশের আইন কানুন কিছুই তো জানি না। চোরাই মাল হেফাজতে থাকলে ক'বছরের সাজা হয় কে জানে।

কতক্ষণ কেটে গেল। একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি সেই কখন থেকে। মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল। এরপর এক সময় দরজার ফ্রেমে একটা মানুষের মূর্তি ফুটে উঠলো। শাদা চাদরে - এ দেশের লোকেরা বলে 'গাবি' - আপাদমস্তক ঢাকা একটি লোক ঘরে ঢুকলো। তার পিছনে সেই আগের লোকটি, দারোগা যাকে গলা হাঁকড়ে নির্দেশ দিয়ে বাইরে পাঠিয়েছিল। আগন্তুককে দেখে দাড়োগা নড়ে চড়ে বসলো। দু'জনে চাপা গলায় কি সব কথাবার্তা হল।

আগন্তুক আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো, "গুড ইভিনিং ম্যাডাম।

প্লীজ টেল মি এভ্রিথিং।"

শুদ্ধ মার্জিত উচ্চারণ। আমাদের দেশে বিলিতী স্কুলে পড়া ছেলেদের মত। ঘোমটা সরে গিয়ে মুখখানা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দু'টি চোখ, শ্যামবর্ণ প্রশান্ত মুখে নিখুঁত ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। বাইশ তেইশ বছরের বেশী বয়স হবে না। দারোগা কাগজ কলম বাগিয়ে উসখুস করছে। আদ্যোপান্ত বললাম সব। শিফারোর কীর্তিকাহিনী। বিদেশে বিভূঁয়ে এসে এক অনভিজ্ঞ মহিলার তিক্ত অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত।

লোকটা আমার বক্তব্যের দ্রুত তর্জমা করে গেল। দারোগা লিখে চললো ঘষ্‌ঘষ্‌ করে।

এজাহার লেখা হলে কাগজখানা আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে দারোগা আমার দিকে কলম উঁচিয়ে বললো, "দস্তখৎ করো।"

আমি সভয়ে পিছিয়ে এলাম।

"আমহারিকে লেখা এজাহারে দস্তখৎ করবো কেন? আমি কি আমহারিক পড়তে পারি নাকি? কাগজে কি লেখা আছে তার ঠিক কি?"

দোভাষী লোকটি মৃদু হেসে বললো, "ভয় পাবেন না। এজাহারে ভুল কিছু লেখা নেই। আপনি নির্ভয়ে দস্তখৎ করতে পারেন।"

আমি তখন ওখান থেকে বেরোতে পারলে বাঁচি। চোখকান বুঁজে দস্তখৎ মেরে বেরিয়ে এলাম।

পিছন থেকে দোভাষী বললো, "মনে থাকে যেন, আগামী মাসের পনেরো তারিখ। পনেরো তারিখে আসবেন আবার।"

এই শহরে ভারতীয়ের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে জন পনেরোর বেশী নয়। এদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষক। UNDP'র লোকও আছে ক'জন। আমাকে থানায় তলব করার খবরটা চাউড় হতে জনে জনে দেখা করে গেল সবাই। মনে হল ওরা বেশ ঘাবড়ে গেছে। দু'একজনের হাবভাব দেখে তো মনে হল ওরা আমাকে ইতিমধ্যেই খরচের খাতায় ফেলে দিয়েছে। ওরই মধ্যে কেউ কেউ আবার সাহসের বাণী শোনালেন।

ফ্যাকাসে মুখে ঢোক গিলে বললেন, "আপনি এ নিয়ে বেশী ভাববেন না। হয়তো শেষ অবধি কিছু না-ও হতে পারে।"

বলা বাহুল্য খুব একটা ভরসা পেলাম না।

মন মেজাজ খুব খিঁচড়ে গেছে। দেশ দেখার শখ এবং অ্যাডভেঞ্চারের মোহে অনেক উৎসাহ নিয়ে বিদেশে এসেছিলাম। সে শখ এবং মোহ দুটোই মিটে গেছে একেবারে চুড়ান্তভাবে। এখন এই চক্রব্যুহ থেকে বেরিয়ে ভালয় ভালয় নিজের কোটায় ফেরার উপায় খোঁজা শুধু ----। হেনকালে খবর পেলাম লালিবেলার দু'জন শিক্ষক নাকি দেশে ফিরে যাচ্ছে। তিন বছরের কনট্র্যাক্ট নিয়ে এসেছিল। ছ'মাসের মাথায় চলে যাচ্ছে বিশেষ জোরালো কোন কারণ দেখিয়ে। আহা ওরা ভাগ্যবান! আমিও যদি ওদের মত দেশে ফিরতে পারতাম ----।

স্টাফরুমে বসে সরবে এবংবিধ হাহুতাশ করছি, সহকর্মী আফতাব আলি শুধোলেন, "আপনি কি সত্যিই যেতে চান?"

বললাম, "চাই-ই তো। পারলে এক্ষুণি। কিন্তু এরা যে ছাড়বে না! কি অজুহাত দেখাবো?"

আফতাব হেসে বললেন, "অজুহাতের জন্যে ভাববেন না, তুরুপের সেরা তাশ রয়েছে আপনার হাতে। আপনাদের মহিলাদের কেউ আটকে রাখতে পারে না। বলুন না গিয়ে আপনার স্বামী হুমকি দিয়েছেন এই দণ্ডে দেশে না ফিরলে উনি আপনাকে তালাক দেবেন।"

"ছি ছি, এ আবার কেমন কথা! আমার স্বামী প্রাণ গেলেও অমন বিদঘুটে চিন্তা মনে আনবেন না।"

"আমি কি তাই বলেছি নাকি? আপনাকে এখান থেকে বেরোনোর একটা শুলুক বাতলে দিলাম। এখন আপনি সেটা কাজে লাগাবেন কিনা তা আপনার মর্জি। ভারি নরম দিল্, করুণাপরবশ এ দেশের মানুষজন। এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট যদি শোনে তাদের ইস্কুলে পড়াতে এসে কোন মহিলা স্বামী-সংসার খুইয়েছে, তামাম ডিপার্টমেন্ট কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেবে। আপনি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। এ একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র ----।"

আফতাব কথাটা কতটা গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন জানি না, আমার কিন্তু মনে ধরে গেল। এর দু'দিন পর আবেদনপত্র নিয়ে রাজধানীতে গিয়ে হাজির হলাম। খোদ বিদ্যামন্ত্রীর দরবারে। আবেদনপত্রে অবশ্য

খোলাখুলি তালাকের উল্লেখ করিনি। লিখেছিলাম, পারিবারিক কারণে বাড়িতে আমার উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজন। স্বামী অবিলম্বে ডেকে পাঠিয়েছেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। এতেই কাজ হল।

চুক্তি থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরার তোড়জোড়ে লেগে গেলাম। প্লেনের টিকিট পেয়ে গেছি। মাত্র কয়েকটা দিন আছে মাঝে। এমন সময় আফতাব আলিই প্রসঙ্গটা তুললেন আবার। চোরাইমাল সেই রেডিওটার কথা। চুক্তি ভেঙে দেশে ফেরা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ওরা আদর করে নিখরচায় প্লেনে চড়িয়ে এনেছে। ফেরার সময় নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে যেতে হবে। এত খরচ-খরচার মধ্যে রেডিও বাবদ ছ'শো টাকা ফ্যালনা নয়।

আমি বললাম, "বাপ্‌রে, ওই রেডিওর কথা আর বলবেন না। ওই ভয়েই তো পাত্তারি গুটিয়ে পালাচ্ছি। আপনি আবার দয়া করে রেডিওর ব্যাপারটা ওদের মনে করিয়ে দেবেন না। শেষ অবধি আমার যাওয়াই ভণ্ডুল হয়ে যাবে।"

কিন্তু আফতাব আলি নাছোড়। সেদিন স্টাফরুমে তালাকের কথাটা খুব সম্ভব ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলেন আর আমি কথাটাকে গুরুত্ব দিয়ে ওঁরই বাতলানো পন্থা ধরে এভাবে হুট করে চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছি গুচ্ছের টাকা খেসারৎ দিয়ে। এতে হয়তো ওঁর সেন্টিমেন্টে বেধেছিল। খরচের দিকটা খানিকটা সুরাহা হলে হয়তো একটু হালকা বোধ করবেন। আফতাব তলে তলে থানাপুলিস ঘুরে খোঁজ খবর নিয়ে এলেন। বললেন, আমাকে একবার শুধু থানায় যেতে হবে।

বললাম, "কোন লাভ হবে না। যাত্রাকালে অনর্থক মনোকষ্ট শুধু।"

আফতাব বললেন, "একবার চেষ্টা করে দেখতে তো আর ক্ষতি নেই! আমি বলে এসেছি কাল সকাল দশটায় আপনি যাবেন। ঘাবড়াবেন না, আমিও সঙ্গে থাকবো।"

আফতাব আলি আট-দশ বছর এদেশে আছেন। নির্ভুল আমহারিক বলেন। ওঁর ছেলেমেয়েদের দু'বেলা ইনজেরা না হলে খাওয়া হয় না। ভদ্রলোক সঙ্গে থাকায় অনেক ভরসা পেলাম। ছ'শো টাকা উপেক্ষা করার মত সামান্য অঙ্ক নয়। টাকাটা যদি উদ্ধার করা যায় মন্দ কি!

আবার সেই জরাজীর্ণ বাড়ির বদ্ধ প্রকোষ্ঠে এসে ঢুকলাম। দারোগা আমাদের দেখে তড়বড় করে উঠে দাঁড়ালো। কক্ষান্তর থেকে দু'খানা চেয়ারের আমদানী হল আমাদের জন্য। তার এই অনুকূল রূপান্তর দেখে চমৎকৃত হলেও কারণটা অনুমান করতে অসুবিধা হল না। আমার আজকের আগমনের উপলক্ষ সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ এবং আমি এখন এদেশে মাত্র দু'দিনের মেহমান। তাছাড়া আফতাব আলিও তাঁর দীর্ঘদিনের শিক্ষকতায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন এ তল্লাটে। একটু পরেই কাসাও এসকেদার এসে পড়লো। আফতাব এসকেদারকে সংক্ষেপে অবস্থাটা বুঝিয়ে বললো। রেডিও চুরির ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হবার আগেই আমি চলে যাচ্ছি। ছ'শো টাকা দিয়ে সরল মনে রেডিওটা কিনেছিলাম, ওটা কি আমারই প্রাপ্য নয়? এসকেদার মত করলে থানা থেকে রেডিওটা আমাকে ফেরৎ দিতে রাজি আছে। রেডিওর দাম বাবদ টাকাটা পরে শিফারোর কাছ থেকে আদায় করে এসকেদারকে দেবার একটা কিছু ব্যবস্থা যথা সময়ে করা যেতে পারে।

এসকেদার নিবিষ্টমনে দাঁত খুঁটছিল। আফতাবের কথা শেষ হতেই দুমদুম্ করে মাটিতে পা ঠুকে চেঁচাতে লাগলো।

আফতাব তর্জমা করে না বললেও আমি বুঝতে পারলাম এসকেদার বলছে, "ওই নচ্ছার পাজির পাঝাড়া শিফারোর কাছ থেকে টাকা আদায় করবে? তবেই হয়েছে! তাছাড়া আদালতে মামলার কি রায় দেবে কে জানে। খুব সম্ভব ওই ছিঁচকে চোরটার জেল হবে। ওকে জেলেই দিক কিংবা ফাঁসিতেই ঝোলাক আমার তাতে কচু। এ রেডিও আমার। এর ন্যায্য দাম না দিয়ে এ জিনিস এখান থেকে নড়াতে পাবে না।"

আমি আফতাবকে বললাম, "যেতে দিন। ও রেডিও পাওয়া যাবে না। পণ্ডশ্রম শুধু শুধু। চলুন যাওয়া যাক।"

উঠে দরজার বাইরে আসার উপক্রম করছি, হঠাৎ, "মিসাস ----", বুকফাটা ডাক ছেড়ে শিফারো আমার রাস্তা আটকে দাঁড়ালো।

বিরক্তমুখে এক পাশে সরে এলাম।

শিফারো দুই হাত সামনে মেলে ধরে বললো, "প্লীজ, প্লীজ মিসাস! বিগ মিসটেক। আই মেক বিগ মিসটেক। ফরগিভ! ফরগিভ!"

কয়েক সপ্তাহ হাজত বাস করে খুব শীর্ণ কাহিল দেখাচ্ছে। একমাথা রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল আর গালভরা দাড়ি। উদ্‌ভ্রান্ত দু'চোখের দৃষ্টি।

শিফারো আকুতি ভরা কন্ঠে বলছে, "প্লীজ ফরগিভ!"

ভারি অস্বস্তি লাগছিল। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। শিফারো দারোগার দিকে ফিরে ব্যগ্র দ্রুত স্বরে কথা বলতে লাগলো। আফতাবের মুখে বিস্ময়ের রেশ ফুটে উঠলো। এসকেদার সমানে মাটিতে পা ঠুকে চলেছে তখনো। শিফারো তার সামনে এসে নিজের বুকে হাত রেখে কি সব বললো এবং তাই শুনে এসকেদার পদচালনা বন্ধ করে শান্ত মুখে দাঁত খোঁটায় রত হল আবার। অন্দর থেকে ছোকরা মত একটা লোক দলিল দস্তাবেজ নিয়ে বেরিয়ে এলো। কাগজ কলম রেডী করতেই দারোগা গড় গড় করে পড়া মুখস্থর মত ক'লাইন বলে গেল। ছোকরা কেরানী ঘাড় হেঁট করে লিখতে লাগলো। লেখা শেষ হলে শিফারোকে কাগজখানা পড়ে শোনালো দারোগা। শিফারো একবার করুণ চোখে আমার দিকে তাকালো। তারপর টেবিল থেকে কলম তুলে নিয়ে নীরবে কাগজে দস্তখৎ বসিয়ে দিলো।

আফতাব দারোগাকে ভুরিভুরি ধন্যবাদ জানালেন খাঁটি আমহারিক ভাষায়।

দারোগা আমার হাতে রেডিওটা তুলে দিয়ে বার দুই মাথা নুইয়ে সহাস্যবদনে বললেন, "গুডবাই মিসাস।"

"গুডবাই, থ্যাঙ্ক ইউ" বলে দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আফতাব বললেন, "রেডিওটা এখন আর কাকে বেচতে যাবেন! আমাকেই দিয়ে যান বরং। এই যে ছ'শো টাকা। নিন ধরুন।"

ওর হাত থেকে টাকাটা নিয়ে ব্যাগে ভরে প্রশ্ন করলাম, "এসকেদার রেডিও দিতে রাজি হয়ে গেল যে বড়?"

আফতাব বললেন, "হবে না কেন, ওর তো লাভ বই লোকসান নেই। শিফারো ওকে আটশো টাকা দেবে যা রেডিওটার আসল দামের চেয়ে অনেক বেশী। দারোগার সামনে স্বেচ্ছায় দলিলে দস্তখৎ মেরেছে শিফারো, যেমন করে হোক তিনমাসের মধ্যে টাকাটা ও এসেকেদারকে

দেবেই।"

এর কয়েক দিন পরে দেশে ফিরে এলাম ----।

(উপসংহার)

আমার বিদেশযাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা এখনও মাঝে মাঝে হাসি ঠাট্টা করেন। তিন বছরের জন্যে বিদেশ গিয়েছিলাম। একটা বছরও পুরলো না, তার আগেই ফিরে এলাম কেন এ প্রশ্ন যারা করেন তারাই আবার মুখে মুখে উত্তরটাও বলে দেন। বলেন, আসলে সে দেশটাও মাটির। দূর থেকেই মনে হয় বুঝি অপূর্ব কিছু। আমি নীরবে হাসিমুখে তাদের মন্তব্য শুনে যাই। মনে মনে বলি সত্যিই অপূর্ব সে দেশ। অপূর্ব সে দেশের মানুষ ----।